দুই কথাকার: মাঝে এক কবি

শচীন দাশ

ছাত্রজীবনে একজন কবির জীবনী নিয়ে আমার মাস্টারমশাইকে একটি উপন্যাস লিখতে দেখেছিলাম। কবির নাম ভারতচন্দ্র এবং লেখকের নাম মিহির মুখোপাধ্যায়। 'জয়শ্রী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বেরোনো সে উপন্যাসটির কিছু কিছু খসড়া শোনার সৌভাগ্য আমার আগেই হয়েছিল। আমাকে উনি শুনিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য তা পাণ্ডুলিপি থেকে। কেননা ভারতচন্দ্রের জীবনী নিয়ে উপন্যাস রচনার ভাবনাটা যখন তাঁর মাথায় আসে তখনও তিনি আমাদের স্কুলের শিক্ষক।

স্কুলের শিক্ষক হিসেবে কেবল পড়াশোনাই নয়, পড়াশোনারও বাইরে সাহিত্যের প্রথম পাঠ আমার তাঁর কাছে। কিন্তু তখনও জানি না তিনি নিজেও একজন লেখক। *দেশ* পত্রিকায় মাঝেমাঝেই তাঁর গল্প প্রকাশিত হয়। জানতে পেরে অবাক হয়েছিলাম। ফলে স্কুলের বাইরে ওই সাহিত্যেরই আকর্ষণে তাঁর টালিগঞ্জের বাড়িতে একসময় আমার অবাধ যাতায়াত গড়ে উঠেছিল। ওই ওখানেই একদিন তিনি আমাকে শুনিয়েছিলেন, ভারতচন্দ্রকে নিয়ে তাঁর লেখা উপন্যাসের খসড়ার খানিকটা অংশ। 'কণ্ঠভরা বিষ'। তখনও তা কোথাও বেরোয়নি। আরও অনেক পরে 'জয়শ্রী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে তা বেরোতে শুরু করে। এবং আমি পরপর পড়েও ফেলি। কিন্তু পড়লেও পাঠক হিসেবে আমাদের আক্ষেপ, অন্তত এতগুলো বছর পার হয়ে আজও সেটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের মুখ দেখল না। কোনো প্রকাশকই এগিয়ে এলেন না। অথচ আমরা শুনেছি, ওই উপন্যাসটি পড়ে সেসময়ে বিদগ্ধজনেদের কেউ কেউ নাকি একান্তে বলেছিলেন এ-লেখা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-এর থেকেও অনেক অনেক ভালো। নারায়ণবাবুর চেয়েও ভালো বলতে সে-সময়ে ওই একই কবির জীবনী নিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিজেও একটি আখ্যান রচনা করেছিলেন। 'অমাবস্যার গান'। তবে দুটি আখ্যান পড়ার পরে উত্তরকালের একজন কথাকার হিসেবে আমারও ধারণা, যদি কোথাও এ-কথা উঠে থাকে তাহলে তাঁরা উপযুক্ত মূল্যায়নই করেছেন। সত্যিই *কণ্ঠভরা বিষ* ভারতচন্দ্রকে নিয়ে লেখা একটি ব্যতিক্রমী আখ্যান।

কিন্তু প্রশ্ন হল, একই কবির জীবনী নিয়ে দু-দুজন আখ্যানকার তাঁদের আখ্যান রচনায় মনোনিবেশ করলেন কেন? কী রয়েছে ওই কবির জীবনে! কী রয়েছে দেখতে হলে একটু পিছিয়ে গিয়ে তাহলে অষ্টাদশ শতাব্দীর ওই সময়টায় একবার আমাদের ফিরে তাকাতে হয়; ফিরতে হয় সে-সময়ে যে সময়টায় ভারতচন্দ্র লিখতে শুরু করলেন তাঁরা কাব্য-গ্রন্থাবলী। অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ, রসমঞ্জরী, সত্যপীরের ব্রতকথা ইত্যাদি। আসলে ১৭১২ সালে যে সময়ে (কারো কারো মতে ১৭০৫ থেকে ১৭১০-এর মধ্যে) ভারতচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাঙালি জীবনে সেটি একটি যুগসন্ধিক্ষণ। কেননা এর পরের আড়াইশো বছর ধরে এক ভয়ংকর ঔপনিবেশিক পরাধীনতার মধ্যে বাঙালি খুঁজেছে নিজেকে। উদ্ধার করার চেষ্টা করেছে তাঁর স্বাধীনতা। গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে তার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজের গড়ন। সমাজের গোড়া ধরে নাড়া দিয়ে উৎখাত করার চেষ্টা

করেছে কুসংস্কার থেকে জাতপাত নামক অস্পৃশ্যতাকে। ফলে বাঙালি জীবনে সময়ের সে এক মহাসঙ্গম। আর সেই সঙ্গমস্থলে দাঁড়িয়ে ওসব জাতপাত ও কুসংস্কারকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে সমাজের মাথাদের তোয়াক্কা না করে একজন কবি এগিয়ে আসছেন শুধুমাত্র তাঁর লেখনীটিকে সম্বল করে। তিনি লিখবেন এসব গোঁড়ামির কথা। তিনি লিখবেন এসব কুসংস্কারের কথা। এবং বাঙালি জীবনকে এসব ভণ্ডামির মধ্য থেকে বার করে এনে সুন্দর এক সমাজের স্বপ্ন দেখাবেন তিনি। কিন্তু তা করতে গেলে কেবলমাত্র ভাবলেই তো হয় না। লিখতেও তো হবে তাঁকে। কিন্তু লিখতে গেলে বুঝি ভাগ্যের সহায়তারও কিছু দরকার হয়। পরিবেশ না পেলে লিখবেনই বা কী করে। কেননা কৈশোরেই তো বুঝে গিয়েছিলেন, জীবন তাঁর কুসুমাস্তীর্ণ নয়! অথচ অবস্থাপন্ন পরিবারের সন্তান তিনি।

পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ছিলেন ভুরসুট পরগনার একজন ভূস্বামী। বাস করতেন বর্তমান হাওড়া জেলার পেঁড়ো গ্রামে। কিন্তু অচিরেই বর্ধমান মহারাজার সঙ্গে সংঘাতে নেমে নরেন্দ্রনারায়ণ তাঁর সর্বস্ব হারিয়ে বসেন। কনিষ্ঠপুত্র ভারতচন্দ্রকে তাই মামাদের আশ্রয়েই চলে যেতে হয়। সেখানেই তিনি বড়ো হতে থাকেন। পাশাপাশি ওই তখন থেকেই তাঁর মনে বারবারই ঘুরেফিরে আসতে থাকে নানা ধরনের পঙ্‌ক্তি। কিশোর ভারতচন্দ্র বুঝতে পারেন ওগুলো কবিতারই লাইন। পঙ্‌ক্তিগুলি কবিতা হয়েই ঘুরেফিরে আসছে। ঘোরাফেরা করছে তাঁর মনে। কিন্তু কেবলমাত্র পঙ্‌ক্তি এলেই তো হবে না। পঙ্‌ক্তিগুলি পরপর সাজিয়ে কবিতা তো রচনা করতে হবে। কিন্তু কী করে কবিতা রচনা করে! সেসব জানতে গেলে তো কবিতা পড়া দরকার। আর কবিতা পড়তে গিয়ে যাঁদের নাম কবি হিসেবে পাচ্ছেন তাঁর সকলেই তো সংস্কৃতে কাব্য রচনা করেছেন। ফলে সংস্কৃত না শিখলে তো ওইসব কবিতা পড়া যাবে না। অগত্যা তিনি মন দিলেন সংস্কৃত শেখায়। সংস্কৃত শিখলে অগ্রজ কবিদের কাব্যরস নেওয়া যাবে। কিন্তু তখনকার অর্থকরীবিদ্যা ছিল ফারসি। সংস্কৃত নয়। ফারসি শিখলে তবু দু-চার পয়সা উপায় করা যায় কিন্তু সংস্কৃতে যে কিছুই নেই। বাড়িতে জানতে পেরে তাঁরা ভারতচন্দ্রকে বোঝায়। কিন্তু ভারতচন্দ্রের ওই একই গোঁ। তিনি সংস্কৃত শিখবেনই। তাঁর এমত কাণ্ডে তাঁর বাবা-দাদারা ক্ষুব্ধ হলেন। পাশাপাশি সে সময়ে আবার একটা ঘটনা ঘটল। বাড়ির অনুমতি না নিয়ে প্রায় আচমকাই তাঁর মামাবাড়ির পাশের গাঁয়ের এক কন্যাকে বিবাহ করে বসায় বাড়িতে তাঁকে নিয়ে সোরগোলও পড়ে গেল। নিরাপদ আশ্রয়ে আর থাকা সম্ভব নয় জেনে ভারতচন্দ্র মামাবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। এসে উঠলেন দেবানন্দপুরে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে, পরে সেখান থেকে ফারসি-পণ্ডিত রামচন্দ্র মুনসির বাড়িতে। এবং যে ফারসি ভাষা শেখা নিয়ে এত বাগ্‌বিতণ্ডা রামচন্দ্র মুনসির প্রশ্রয়ে সে ভাষাটি তিনি শিখে ফেললেন এখানে এসে। এবারে আর তাঁর বাড়িতে ফেরায় আপত্তি নেই।

ভারতচন্দ্র বাড়িতেই ফিরে এলেন। ফারসি শিখে এসেছে জেনে বাড়ির লোকজনদের আর ক্ষোভ রইল না। এবার তাঁকে পারিবারিক সম্পত্তির মোক্তার করে বর্ধমান রাজার রাজসভায় পাঠালেন। কিন্তু কিছুদিন পর নিয়মিত সময়ে খাজনা জমা না পড়ায় ভারতচন্দ্রকে গ্রেফতার করা হয় ও রাজাদেশে তাঁকে কারাগারে যেতে হয়। কিন্তু বেশ কিছুদিন কারাবাসভোগের পর কারাধ্যক্ষকে হাত করে তারই সাহায্যে তিনি কারাগার

থেকে গোপনে পালালেন। পালিয়ে তিনি কটকে মারাঠাদের একটি ডেরায় গিয়ে হাজির হলেন। কিছুদিন সেখানে থেকে পরে সেখান থেকে পুরীতে পালিয়ে শঙ্করমঠে আশ্রয় নিয়ে বৈষ্ণব গ্রন্থাদি পাঠ করতে থাকেন। ওই বৈষ্ণবশাস্ত্র ও বৈষ্ণবগ্রন্থাদি পাঠ এবং বৈষ্ণব ভক্তদের সংস্পর্শে এসে একসময় ভারতচন্দ্র নিজেও যে কখন পরম বৈষ্ণবও হয়ে উঠলেন তা তিনি নিজেও জানেন না। তখন তাঁর ধ্যানজ্ঞান সবই বৈষ্ণব তত্ত্বদর্শনকে ঘিরে। এই সময়েই তাঁর পরিচয় ছিল 'মুনি গোঁসাই' নামে। হয়তো বৈষ্ণবদের সঙ্গে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে তিনি ভারতদর্শনে বিভোর হয়ে থেকে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতেন। কিন্তু ভবিষ্যতে আরও অপমান, আরও লাঞ্ছনা, আরও অত্যাচারিত হয়েও যে শেষপর্যন্ত তিনি কবিতা লিখবেন ও খানকয়েক কাব্যে অমর হয়ে থাকবেন— নিয়তির এহেন নির্দেশেই বোধহয় তিনি ওই সন্ন্যাসজীবনের অবসান ঘটিয়ে ফিরে এলেন ফরাসডাঙায়। আশ্রয় পেলেন ফরাসি সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাছে। পরে সেখান থেকে কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজদরবারে। তা মহারাজা কবিদের সম্মান করতেন। এবং কবি হিসেবে এখানে তিনি সম্মানও লাভ করলেন। অচিরেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে তাঁর রাজসভার সভাসদ করে নিলেন। তাঁর মাসিক বেতন দাঁড়াল চল্লিশ টাকা। এখানেই তিনি সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন গোপালভাঁড়ের।

কিন্তু এই বিদূষকের সস্তা, অশ্লীল ও নিম্নশ্রেণির ভাঁড়ামি ভারতচন্দ্র মেনে নিতে পারেননি। সম্ভবত কৃষ্ণচন্দ্রও অনেকাংশে মানতে পারতেন না গোপাল ভাঁড়কে। অনেকসময় অসহ্যও হয়ে উঠত। কিন্তু হলেও ফেলতেও পারতেন না। শেষে ভারতচন্দ্রকে পেয়ে তিনি অনেকটাই স্বস্তি পেয়েছিলেন। কেবল তাইই নয়, তাঁর সভাসদ হয়ে থাকাকালীনই ভারতচন্দ্র যে দুটি কাব্য রচনা করেছিলেন তার একটি পড়ে কৃষ্ণচন্দ্র তো মুগ্ধই একরকম। এরপরে 'অন্নদামঙ্গল' লেখা হলে কবির প্রতিভায় মহারাজ ভারতচন্দ্রকে মুলাজোড় গ্রামটি ইজারা দেন। 'অন্নদামঙ্গল'-এর প্রথম খণ্ডে *কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন* অংশটি ভারতচন্দ্র যখন পড়ছেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র-এর রাজসভায় সভাসদরা সবাইই তখন বাকরুদ্ধ। এমনকি মহারাজেরও যেন পলক পড়ে না।

নিবেদনে অবধান কর সভাজন।
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভার বিবরণ॥
চন্দ্রে সবে ষোলোকলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥
পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রেরে দেখিলে।
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মিলে॥
চন্দ্রের হৃদয়ে কালি কলঙ্ক কেবল।
কৃষ্ণচন্দ্রহৃদে কালী সর্ব্বদা উজ্জ্বল॥

এবং এই কাব্যের প্রথম খণ্ড-এর শেষে *অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা*-য় এসে যখন পড়ছেন:

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে॥

সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী।
একা দেখি কুলবধূ কে আপনি॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফেরফার॥

এবং তারও পরে যখন পরিচয় পেয়ে ঈশ্বরী পাটনী তাঁকে দেবী জেনে পার করে দিয়েছেন তখন দেবী তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে বর চাইলে বললে পাটনী যখন বর চাইছে তখন কৃষ্ণচন্দ্রের দুচোখ বেয়ে বারিধারা নেমেছে।

প্রণমিয় পাটুনী কহিছে যোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান।
দুধেভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান॥

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে এসে জড়িয়ে ধরলেন। আর ওই তখনই তাঁকে মুলাজোড় গ্রামটি ইজারা দেন। কিন্তু তা অবশ্য বেশদিনের জন্য নয়। কেননা বর্গীর আক্রমণের ভয়ে বর্ধমানের রাজপরিবার মুলাজোড়ের কাছে এসে বসতি স্থাপন করলে তাঁরা কৃষ্ণচন্দ্রকে অনুরোধ করলেন গ্রামটি তাঁদের পত্তনি দিতে। কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে ওই গ্রামটি পত্তনি দেওয়ায় বর্ধমানের রাজপরিবার তাঁদের কর্মচারী রামচন্দ্র নাগকে পত্তনিদার নিযুক্ত করলেন। ভারতচন্দ্র গোড়া থেকেই এই পত্তনি দেওয়ার বিরোধী ছিলেন। কেননা ওই রামচন্দ্র নাগকে তিনি জানতেন। তাঁর মতো অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর বাংলায় তখন খুব কমই ছিল। কিন্তু কথাটা কৃষ্ণচন্দ্রকে জানিয়েও তিনি তাঁকে রাজি করাতে পারেননি। ফলে যা হওয়ার তাই হল। মুলাজোড়ের বাড়িতে পত্তনিদার রামচন্দ্রের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যখন আর পারছেন না তখন তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে কথাটা সবিস্তারে জানান। জানিয়েছিলেন 'নাগাষ্টক' নামে সংস্কৃতে একটি কবিতা লিখে।

কৃষ্ণচন্দ্র বিপন্ন কবিকে স্বস্তি দেবার জন্য তাঁর অন্যত্র বাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। ভারতচন্দ্র চলে যাওয়ার জন্যও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু গ্রামবাসীদের ভালোবাসা ও একান্ত অনুরোধে আর যেতে পারলেন না। ওখানেই থেকে গেলেন। শেষ পর্যন্ত ওই মুলাজোড়েই বহুমূত্র রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

মাত্র আটচল্লিশ বছরের কবিজীবন তাঁর। মতান্তরে পঞ্চাশও হবে হয়তো। কিন্তু ওই স্বল্পজীবনেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন বিস্তর। কিন্তু তা অভিজ্ঞতার জন্যই যে অভিজ্ঞতা তা নয়! কারণে-অকারণে নানাভাবে হেনস্থায় পড়ে তাঁকে বিচিত্র জীবনযাপন করতে হয়। ফলে বিচিত্র চরিত্রের মানুষকে দেখেন সারাজীবনভর। এদের কেউ কেউ ভক্ত, কেউ তাত্ত্বিক পণ্ডিত, কেউ সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব, কেউ কেউ ঘুষখোর, কেউ জেলরক্ষক, কেউ বা চতুর-চটুল ও সুবিধাবাদী। কেউ বা আবার খোসামুদে। ওদিকে জীবন তাঁর বিচিত্রপথগামী হওয়ায় কেবলমাত্র বেঁচে থাকার জন্যই জীবনভর কিছু কিছু ধনীশ্রেণির আনুকূল্যেই তাঁকে জীবননির্বাহ করতে হয়েছিল— যা তিনি একেবারেই মেনে নিতে

পারেননি। মানতে পারেননি, বাংলাদেশের ওপর মোগল সুবেদারদের অর্থনৈতিক শোষণ। সুবেদারেরা বাংলার মাটি থেকে নির্মমভাবে শোষণ চালিয়ে কোটি কোটি টাকা সম্রাটের কোষাগারে পাঠাতেন ও নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি ঘটাতেন। তাছাড়া নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের ওপর চলত অতিরিক্ত অত্যাচার। মোগল সুবেদারদের অধিকাংশই ছিল অসচ্চরিত্র, অর্থলোলুপ, বিলাসী ও কামুক। এর প্রভাব অমাত্যবর্গের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে বাংলার নারীদের নিরাপত্তা বলে কিছুই ছিল না। এর ওপর আবার বর্গীর হাঙ্গামা ও মগ-পর্তুগীজদের হানাদারি গোটা বাংলাকে শ্মশান করে দিচ্ছিল। ফলে গোটা দেশে একটা দূষিত ও শোষণ-রাজ কায়েম হয়েছিল। ভারতচন্দ্র এসব লক্ষ করেছিলেন মন দিয়ে। আর নানাভাবেই এসবকে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর কাব্য ও নাটকের নানান স্তরে। বাঙালি জীবনের ওই দুঃসময়কে তিনি ধরে রাখতে চেয়েছিলেন কৌতুক ও রূপকের অন্তরালে।

বাঙালি জীবনের ওই যুগসন্ধিক্ষণকে ধরার জন্যই বোধহয় ভারতচন্দ্রকে সামনে রেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের ওই দুই কথাকার। একজন ভারতচন্দ্রকে সামনে রেখে ওই সময়কে ধরেছেন তাই তাঁর নিজের মতো করে। তিনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। অন্য এক কথাকার মিহির মুখোপাধ্যায়। তিনিও ভারতচন্দ্রকে আবিষ্কার করতে করতে ও সেই সময়কে ধরার জন্য কখনও ফরাসডাঙা, কখনও বা আবার কৃষ্ণনগরে গিয়েছেন। কখনও ফরাসডাঙায় ফরাসী সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাছে, কখনও বা আবার কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে। তাঁর সভায়। পাশাপাশি উঠে এসেছে আবার সময়। এবং ওই সময়কে ধরার জন্যই যেন নারায়ণবাবু ও মিহিরবাবু ভারতচন্দ্রকে সামনে রেখে তুলে এনেছেন এক যুগসন্ধিক্ষণের বাংলা। নারায়ণবাবুর 'অমাবস্যার গান' ও মিহির মুখোপাধ্যায়ের 'কণ্ঠভরা বিষ' তাই ওই সময়েরই দুটি দলিল। তবে নারায়ণবাবু বিষয়টিকে যতটা সহজ ও সরল করে ধরেছেন মিহিরবাবু সেখানে ব্যতিক্রম। তাঁর অনুসন্ধান শিল্প ও শিল্পীর গভীরে এবং তা ভারতচন্দ্রেরই সমাজবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর যন্ত্রণা ও সমাজজীবন সম্পর্কে তাঁর (ভারতচন্দ্রের) ভাবনাকে যথেষ্টই গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন কথাকার মিহির মুখোপাধ্যায়। কেবল তাইই নয়, ভারতচন্দ্র ও সমসময়কে বুঝতে হলে ওই উপন্যাসটিও বোধহয় খুবই জরুরি। কিন্তু সেটি পাওয়া এখন খুবই দুর্লভ। হয়তো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অমাবস্যার গান'-এর কথা অনেকে এখনও জানলেও 'কণ্ঠভরা বিষ'-এর কথা বোধহয় কেউই জানেন না। না জানার অপরাধ তাদের নয়। একটি এখনও পাওয়া গেলেও অন্যটি জীর্ণ হচ্ছে কালের গর্ভে। যদি আগামীদিনে সময় কখনও সত্য হয়, বা সস্তা জনপ্রিয়তার ধারাটিকে বাঙালি কোনোদিন পরিহার করে তবে কি এমন একটি উপন্যাসকে কালের গর্ভে বিলীন করার জন্য এসময়কে সেদিন দায়ী করবে না আগামী কালের পাঠক? কী জানি, সময়ই সেদিন কথা বলবে!